ভক্তের আকুতি পর্যায়ে যুগজীবনের দুঃখ ও নৈরাশ্য

মধ্যযুগের শেষলগ্নে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তির আরাধ্যা দেবী দুর্গা বা কলিকার বন্দনা করে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে তা শাক্ত পদাবলী নামে পরিচিত। শাক্ত পদকর্তারা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে তাদের পদগুলি রচনা করেছেন। এই পর্যায়গুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হল ভক্তের আকুতি। 'আকুতি' কথাটির অর্থ 'অভিলাস বা আগ্রহ'। শাক্ত পদকর্তারা শক্তির দেবীকে মহাদেবী রূপে কল্পনা করে এই পদগুলির মাধ্যমে তার চরণে নিজের অভিলাসের কথাই বলেছেন। স্বাভাবিকভাবে তাদের কবিতায় নিজেদের জীবনের নানা দুঃখ, দুর্দশার কথা এসেছে। এরফলে পদগুলিতে তৎকালীন যুগসমাজের অনেকটাই চিত্রিত হয়েছে।তবে শাক্ত পদকর্তারা তাদের পদে শুধু দুঃখের কথাই বলেন নি; পাশাপাশি মায়ের কাছে থেকে এই দুঃখ দূর করার জন্য সাহস ও প্রতিরোধের দীক্ষামন্ত্রও চেয়েছেন।

সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এযুগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ম প্রাধান্য পেয়েছে। কবিরা তাদের আরাধ্য দেবদেবীর কাছে অর্থ, সুখ, নিরাপত্তা প্রভৃতি প্রার্থনা করেছেন। আবার বৈষ্ণব পদাবলীতে বৈষ্ণব ভক্তেরা রাধাকৃষ্ণের নাম জপ করে মানস বৃন্দাবনে তাদের নিত্যলীলা দর্শনের অভিলাস ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে শাক্তকবির সঙ্গে জগন্মাতার সম্পর্ক সন্তান-মাতার। এ সম্পর্ক অতি সহজ এবং আন্তরিক। প্রকৃতপক্ষে সন্তান ও মায়ের মধ্যে স্নেহ-মমতা, মান-অভিমানের যে সম্পর্ক থাকে শাক্ত পদকর্তারা এখানে সে সম্পর্কেই জগৎ মাতাকে দেখেছেন। এর পরিচয় কবিদের আকুতিতে, অভিমানে, কখনও বা রোষে অতিস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দাস গীতিকবিতা বিষয়ক একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন এই অভিমানই বাংলা কবিতার সম্পদ। এমন করে অভিমান পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই প্রকাশিত হয়নি।

ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলিতে কবিদের অভিমান, দুঃখ, রোষ, আকুতি প্রভৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। কবিরা এই পদগুলিকে তাদের সাধনতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাই তারা খুব সহজেই বলেছেন—

''তাই আমি অভিমান করি শঙ্করী।''

এই অভিমানবশত কবি দুঃখ পেয়ে তা প্রকাশ করে বলেছেন—

''মাগো তারা ও শঙ্করী
কোন অবিচারে আমার 'পরে করলে দুঃখের ডিক্রিজারি।''

আবার এই অভিমান যখন চরম সীমায় পৌঁছায় তখন কবি বলেন—

''এবার কালী তোমায় খাব
তুমি খাও, নয় আমি খাই, দু'টোর একটা করে যাব।''

উপাস্য দেবীর সঙ্গে কবিদের এই সম্পর্ক ছিল জন্যেই তারা কখনই পার্থিব সম্পদের জন্য লালায়িত হয়নি। পদগুলির যেখানেই দুঃখের দাবানল থেকে মুক্তির দাবী করেছেন, সেখানেই মায়ের প্রতি সন্তানের দাবীতেই করেছেন। এখানে কবিরা কেবল মায়ের অভয়পদ প্রার্থণা করেছেন; কারণ তারা জানেন মায়ের অভয়পদে আশ্রয় নিতে পারলেই সংসারের মায়াবন্ধন কেটে যাবে। তাই তাদের আকুতি কখনোই নৈরাশ্যবাদীর ক্রন্দন হয়ে পড়ে নি। দুঃখ যখন তীব্র তখন মন ভেঙে পড়াই স্বাভাবিক; কিন্তু মাতার প্রতি অসীম বিশ্বাসে কবিরা বুঝতে পেরেছেন যে, দুঃখই দুঃখের শেষ কথা নয়— দুঃখ কেবল ভবযন্ত্রণা ও মায়াবদ্ধতার একটি দিক মাত্র, মায়ের বরাভয় পেলে দুঃখ আর থাকবে না। শাক্ত কবিরা বিশ্বাস করতেন জীবনে দুঃখ আছে— তাই তারা কখনোই জীবন বিমুখ হন নি। যেমন একটি পদে বলা হয়েছে—

''মা, না করি নির্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরখি চরণ দু'টি হৃদয়ে রাখিয়ে।''

ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলিতে ভক্তের এই মর্ত প্রীতি ও অস্ত্যর্থক চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে।

শাক্ত কবিগণ দুঃখের জ্বালায় কখনও কখনও মুক্তির প্রার্থণা করেছেন। তারা কখনও মায়ের কাছে আকুতি জানিয়ে বলেছেন—

''ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।''

কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কবিরা তদের জীবনের এই দুঃখকে মায়ের লীলা মাত্র বলেছেন। যেমন রামপ্রসাদ বলেছেন—

''ও মা কালী চিরকালই সঙ্ সাজালি এ সংসারে
এ সঙ্ সাজায় নাইকো মজা, সাজা পাই মা অন্তরে।''

এ ভাবনা ছিল জন্যেই শাক্ত কবিরা দুঃখে ভেঙে পড়েন নি। তারা মায়ের কাছে প্রশ্ন করেছেন— 'আমি কী দুঃখেরে ডরাই?'। কবিরা জানেন তাদের জীবন থেকে দুঃখ চলে যাবে। তাই তারা শেষপর্যন্ত মায়ের চরণেই আশ্রয় পেতে চান—

''মনের এই বাসনা শ্যামা শবাসনা, শোন মা বলি
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা কালী কালী।''

এভাবে শাক্ত পদকর্তারা তাদের রচিত পদগুলিতে জীবনের নানা দুঃখের কথা নিবেদন করেও শেষপর্যন্ত তাদের আরাধ্যা মায়ের চরণে আশ্রয় পেতে চেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের পদগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার অবক্ষয়ের যুগের যুগ জীবনের দুঃখ ও নৈরাশ্য ছায়া ফেলেছে। কিন্তু দুঃখ ও নৈরাশ্যকে তারা জীবনের সর্বস্ব বলে মেনে নিতে চান নি— সেখান থেকে উত্তরণের কথা বলেছেন। সামাজিক জীবনপটে তারা মায়ের চরণে নিজেদের আকুতি জানিয়ে দুঃখকে জয় করার জন্য সাহস ও প্রতিরোধের দীক্ষামন্ত্র লাভ করতে চেয়েছেন। এই শাক্ত পদকর্তাদের চাওয়া পাওয়ার সাথে বৈষ্ণব পদকর্তাদের চাওয়া পাওয়ার পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব পদকর্তাদের বেশিরভাগই ছিলেন সংসার ত্যাগী। তাদের উপাস্য দেবতা পার্থিব সম্পদের দেবতা নয়; প্রেমের দেবতা। কিন্তু শাক্ত পদকর্তাদের পদে শক্তির দেবী বিপন্ন মানবকে অভয়দানের জন্য আবির্ভূতা। স্বাভাবিকভাবে ভক্তের আকুতি পর্যায়ে পার্থিব ঐশ্বর্যলাভের চিন্তা ও সুখভোগের আর্তি এসেছে, তবে তা স্বতন্ত্রভাবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলিতে জগন্মাতার সঙ্গে পদকর্তাদের সরাসরি মাতা-পুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পদকর্তারা শক্তিদেবীর কাছে নিজেদের আকুতি জানিয়েছেন। তাই পদগুলিকে আধ্যাত্ম সঙ্গীত হিসাবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু পদকর্তাদের আকুতিতে ভক্তিভাব যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, প্রায় সমপরিমাণ অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগজীবনের হতাশা, নৈরাশ্য, যন্ত্রণা প্রাধান্য পেয়েছে। তাই শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলি নিছক আধ্যাত্ম সঙ্গীত হয়ে থাকেনি, যথার্থ মানব সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। শাক্ত পদকর্তারা প্রায় সবাই সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তাদের এই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনের প্রভাব তাদের উপস্থাপনাতেও পড়েছে। স্বাভাবিকভাবে সাধনতত্ত্বের বিষয় হলেও পদগুলি যে কোন পাঠককে আকৃষ্ট করে। তাই সামাজিক জীবনকে নিয়ে লেখা শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলি সাধনতত্ত্ব হয়েও যথার্থ মানব জীবন সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। এরসাথে যুক্ত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগযন্ত্রণা, হতাশা, নৈরাশ্য এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাহস ও প্রতিরোধের ভাবনা।